দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 OCT 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ...

085

পরীক্ষার ফলাফল ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ডঃ আবুল হাসান শামসুদ্দিন

সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শিক্ষা জীবনে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষার খেয়াতরী কিশোর শিক্ষার্থীদেরকে পরবর্তী কর্মজীবনের যাত্রাপথের গোড়ায় পৌঁছে দেয়। কর্মজীবনে কোন পেশা অবলম্বন করবে—উচ্চ মাধ্যমিকের পর তা বাছাই করে নেয়ার পালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, আর্কিটেকচার, পলিটেকনিক ইত্যাদি আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা ও পেশা শিক্ষার প্রধান প্রধান ক্ষেত্র। কিন্তু আসন সংখ্যা এতই সীমিত যে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কে কোথায় ভর্তি হতে পারবে কোনই নিশ্চয়তা নেই। তাই একই ছাত্র বহু জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দেন। ঈপ্সিত স্থানে ভর্তি হতে না পারলে পর পর দু'বছর তিন বছররও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এমনও দেখা যায়, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বছর কিংবা দু'বছর লেখাপড়া করেও পরবর্তীতে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভর্তি হয়। বোঝা যাচ্ছে, শেষোক্তটাই তার একান্ত কাম্যস্থল।

এতো গেল 'ভাল' ছাত্রদের কথা। যারা দু'টো প্রথম বিভাগ লাভ করতে পারে, সাধারণত তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক নম্বর প্রাপ্তরাই উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়ার আশা করতে পারে। যারা কম ভাগ্যবান তাদের সংখ্যাই অধিক। আমি এখানে দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর কথাই বলছি। তাদের জীবনেও তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। তাদের অভিভাবকগণওতো সন্তানদের নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করেন। তারাও ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার কিংবা মেডিক্যাল পড়বার সুযোগ পেলে অবশ্যই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারতেন। কিন্তু তাদের সে সুযোগ কোথায়। বাধ্য হয়ে তাদের অধিকাংশ ডিগ্রী পাস কোর্সে ভর্তি হয়; কেউ কেউ কলেজের খাতায় নাম রেখে চাকুরী খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু চাকুরীর ক্ষেত্র আরো সংকুচিত। তাই খুব নগণ্য সংখ্যকের ভাগ্যেই শিকা ছেঁড়ে। এর ফল হচ্ছেঃ তরুণ সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশা ও নৈরাশ্য শিক্ষাঙ্গনে আশান্বিত ও হানাহানি, পরীক্ষায় ব্যাপক নকলবাজি, রাজনীতির নামে তরুণ সমাজকে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করেছে—অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা সবাই কি ঈপ্সিত স্থানে ভর্তি হতে পারবে? বিষয়টা ভাল করে বুঝবার জন্য এবারকার ফলাফলের পাতায় চোখ বুলানো যাক।

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এবছর সর্বমোট ২ লাখ ৬৩ হাজার ২শ' ৯৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫শ' ৭৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাসের হার ৫৬.৪২ জন। ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ৪৮.৪২ জন, রাজশাহী বোর্ডের ৬২.৭২ জন, কুমিল্লা বোর্ডের ৬১.৬৯ জন এবং যশোর বোর্ডের ৫৬.৪৬ জন।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ১৩,৫০৮ জন ১ম বিভাগে, ৮২,৯১৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৫২,১৫৪ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। ভাল ছাত্রদের বেশি ঝোঁক মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দিকে; তারপরেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অর্ধেকের স্থান সংকুলান হবে না। এর পরে বাকী থাকলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী কলেজসমূহের অনার্স কোর্স। এসব ক্ষেত্রেও ভর্তি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বাছাই করা বিষয়ে এবং ঢাকার কয়েকটি বিশিষ্ট কলেজে ভর্তি হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা বোর্ডের ১ম স্থান অধিকারী ঢাকা কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জায়গা দেওয়ার পরে দ্বিতীয় বিভাগের কিছু ছাত্র সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজসমূহের অনার্স কোর্সে সুযোগ লাভ করে। পলিটেকনিক সমূহেও কিছু ছাত্র ঠাঁই পায়। বেসরকারী কলেজের পাস কোর্স ব্যতীত তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের আর কোন ঠাঁই নেই বললেই চলে। কলেজের খাতায় নাম লেখা থাকে। কিন্তু পরীক্ষার সময় ছাড়া কলেজগুলোতে উপস্থিতির হার খুবই কম। দেশের হাজার হাজার ছাত্রের বই-পত্র কিংবা লেখাপড়ার সংগে সম্পর্ক খুব সামান্য। পরীক্ষার হলে কিভাবে খাতা লেখা হয়, কিভাবে সে খাতা পরীক্ষা করে পাস-ফেল নির্ণয় করা হয়—সে বিষয়ে অনেকেই অবহিত আছেন। জাতির ভবিষ্যত ইতিহাসে এই বংশধরগণ কি অবদান রাখবে—ভাবলে শিহরিত হতে হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা অনেকেই চায়, বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যারা বিজ্ঞান শাখায় পড়েছে, তারা সকলেই বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আগ্রহী। কিন্তু সুযোগ সীমিত বলে অনেককেই লাইন বিচ্যুত হতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ১ বা ২ বছর সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে লেখাপড়া করার পরও, মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সুযোগ পেলে তারা চলে আসে। এ থেকেই সাধারণ প্রবণতা বোঝা যাবে।

এক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ—বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আরো বেশি করা যায় না? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এ মুহূর্তেই বাড়ানো সম্ভব না হলেও প্রতিক্ষেত্রে কিছু আসনতো বাড়ানো যায়।

মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের জন্য বৃত্তিমূলক উচ্চ শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না? বিভিন্ন অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ইত্যাদিতে মাঝারি মর্যাদার অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে এসব পদ উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাস প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রীধারীদেরও এ-সব পদে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে সব পদে এরা নিযুক্ত হয়ে থাকে তার জন্য এদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ নেই। তারা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখে কর্মক্ষেত্রে তা কোন কাজে লাগে না। অথচ এটা সহজেই বোধগম্য, যে কাজে তারা নিযুক্ত হয়, সে বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের লেখাপড়া ও বাস্তব প্রশিক্ষণ থাকলে কর্মক্ষেত্রে তা খুবই সহায়ক হতো।

এ-ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের জন্য বৃত্তিমূলক স্নাতক কোর্স প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের কিছু কিছু কোর্স আছে। আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে অফিস প্রশাসন, ব্যবসা-প্রশাসন, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে স্নাতক পাসকোর্স প্রবর্তন করা যায়। এছাড়া দেশের বেসরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচুর শিক্ষকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। সাধারণ কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক (পাস) কোর্স পর্যন্ত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক গ্রুপের মত একটি শিক্ষা গ্রুপ প্রবর্তনের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। এই পর্যায়ে যারা স্নাতক পাস করবে, তাদের সাধারণ স্নাতক ও বি, এড, পাস শিক্ষকের সমমর্যাদায় যে কোন বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যাবে। দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, সে চাহিদা পূরণের জন্য এর চেয়ে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা আর হতে পারে না। বর্তমানে দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে যে আসন-সংখ্যা রয়েছে সেই তুলনায় দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনেক বেশি। এই প্রেক্ষিতে সাধারণ কলেজসমূহের উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) পর্যায়ে স্বতন্ত্র শিক্ষাগ্রুপ প্রবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকের প্রসংগের ইতি টানছি। আর কিছুদিনের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে। এবারকার ভর্তির পদ্ধতি কি হবে আমরা জানিনা। অতীতে দেখা গেছে, মেডিক্যাল কলেজে ও অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ভর্তির ব্যাপারে কেবল ছাত্রের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করা হয়েছে। এ-পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও অবশ্য পরিত্যাজ্য। কারণ, অনেক ছাত্র জাল মার্কশীট দাখিল করে ভর্তি হওয়ার ২/৩ বছর পরেও ধরা পড়েছে এবং তখন তাদের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। তাই সৎ ও নিষ্ঠাবান ছাত্র এবং অভিভাবকগণ আশা করেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির প্রেক্ষিতে মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে-কোন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ওপর যেন গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরও মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। যারা নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারে তারা ভর্তির সুযোগ পায়। আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাই।